

टिद्द आठिब्र
टेठिटास

বই
লেখক
অনুবাদ
নিরীক্ষণ
সম্পাদনা
প্রচ্ছদ
অঙ্কসজ্জা
প্রকাশক

হিন্দু জাতির ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ.
মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন
মাহদি হাসান
মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল ফাতাহ মুন্না
মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

হিন্দু জাতিৰ ঐতিহাস

হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন ধৰ্ম চতুষ্টয়
সত্য, যুক্তি ও তত্ত্বের নিরিখে

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ.



মুহাম্মদ পাবলিশিং



প্রকাশকের কথা

মুহতারাম পাঠক, ‘হিন্দু জাতির ইতিহাস’ শীর্ষক গ্রন্থটি অবশেষে আপনাদের সম্মুখে আনতে পেরেছি। স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তে মুখ ফসকে বেরিয়ে আসছে আলহামদুল্লিহা।

ভারতবর্ষে যে সকল জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বী রয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি ধর্ম ও ধর্মের ইতিহাস, তাদের জীবনাচার, সংস্কৃতি চর্চা, প্রাকৃতিক গড়ন ও সত্যাস্থেয়া, সমূহ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি, আন্তপ্রতিবেশি সুসম্পর্ক ও বৈরিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

ওই সকল ধর্মে ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কাছে সত্যধর্ম তথা ইসলামের দাওয়াত কীভাবে পৌঁছেছে, কেন তারা সত্যধর্মকে গ্রহণ করেছেন বা করেননি, পূর্বকার ইতিহাস ও পরের ইতিহাসের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা, তাদেরই বিবৃত বা গৃহীত ধর্মগ্রন্থের আলোচ্য বিষয়কে তারা কীভাবে পাশ কাটিয়ে যায়—ইত্যাকার বিশদ বিবরণ উঠে এসেছে এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়, অধ্যায়ে ও কথামালার আবরণে।

গ্রন্থটি আরবি ভাষায় লেখা। লেখক স্বয়ং নওমুসলিম। কিন্তু নওমুসলিম হলেও তার আলোচনা ও গভীর দৃষ্টিপাত ঐতিহ্যগত মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, নাড়িয়ে দিয়েছে, জাগিয়ে দিয়েছে রীতিমতো। সত্যপথকে আবিষ্কারের তথা হিদায়েতের পথে তার যে দুস্তর অভিযাত্রা, তা অলৌকিক প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ পথে মহান আল্লাহই যে তার একমাত্র সহায়, এ কথা নির্দিধায় বলা যায়।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন আমাদের সময়ে বাংলা ভাষায় দ্বীনের একজন বলিষ্ঠ দাঈ ও মুবাঈলিগ জনাব মুহাম্মদ বোকন উদ্দিন। দ্বীনের পথে তার

গভীর চিন্তাশীলতা ও অবিচল নিষ্ঠা আমাদের তারুণ্যের পাথেয় তথা উজ্জ্বল দিগ্দিশা হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা।

পরিশেষে বলব, সব অনুবাদ এক নয়। সব বই এক নয়। ঠিক এটিই অন্য পাঁচ/দশটি বইয়ের মতো নয়। ভিন্ন ও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। নানা জটিল শব্দ, স্থান, প্রাগৈতিহাসিক ব্যক্তি ও বিকৃত ধর্মাচারসহ নানা কালের বিবর্তন ও বিবরণ যথাশব্দে প্রয়োগ দিতে পারা, সে বড়ই কঠিন কাজ। সেই কঠিন বিষয়গুলোকে আমরা শতভাগ নির্ভুল করতে চেষ্টার কোনোরূপ ত্রুটি করিনি। তারপরও যেকোনো অসঙ্গতি বা বিচ্যুতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে, আমাদের জানিয়ে বাখিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রাখছি। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেবো, ইনশাআল্লাহ।

এ কাজে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর, তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যত অসুন্দর ও বেখেয়ালি, তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতারই ফসল। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.



অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله
وأصحابه أجمعين، أما بعد ...

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মানুষের হিদায়েতের জন্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে, সত্যপথের দিশা দিতে পাঠিয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থও। শরিয়তের বিধিবিধান দিয়ে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে পথচলার নির্দেশনা দিয়েছেন। তারপরও অবধ্য শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ অনেক সময়ই দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়তের মধ্যে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো সংযোজন-বিরোজন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নিয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে এই বিচ্যুতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, মানুষ আসমানি শরিয়ত পুরোপুরি বাদ দিয়ে নিজেদের মতো করে দ্বীন-ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। পৃথিবীতে বিরাজমান মানবরচিত এসব ধর্ম ও তার অনুসারীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।

ভারতবর্ষ। বৈচিত্র্যময় একটি অঞ্চল। এখানকার সবকিছুতেই বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ভৌগোলিকভাবে উপমহাদেশ বলা হলেও আয়তনের দিক থেকে এটি কোনো কোনো মহাদেশের চেয়েও বিশাল। বৈচিত্র্যময় এই বিশাল ভূখণ্ডে নানান ধর্মের মানুষ বসবাস করেন। এখানে যেমন রয়েছে আসমানি ধর্মের অনুসারী, তদ্রূপ রয়েছে মানবরচিত ধর্মের অনুসারী। ইসলামের উষালগ্নেই এখানে সত্যের দাওয়াত পৌঁছালেও দুঃখজনকভাবে এখন পর্যন্ত এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী এই মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো—এখানে শত শত বছর যাবৎ মুসলিম শাসনও বিদ্যমান ছিল। এটি ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার পরিচায়ক হলেও অন্য দিক থেকে ভাবলে এটি একপ্রকার ব্যর্থতাও বটে। কারণ, মুসলিমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকলেও সাধারণ জনগণের কাছে ইসলামের দাওয়াত খুব বেশি পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। শত শত বছর মুসলিম শাসন বিদ্যমান থাকলেও কয়েকজন



এই বইয়ের গল্প

সকল প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বিশ্বস্ত রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পূতপবিত্র পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের ওপর।

এই বইটির একটি গল্প আছে; আমার মনে হয় পাঠকের তা সংক্ষেপে জানা উচিত। আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে তাঁর বিশুদ্ধ ইসলামে জায়গা করে দিলেন, আমার এই নব নির্বাচিত ধর্ম নিয়ে হিন্দুধর্মের পণ্ডিতদের একটি দলের সঙ্গে আমার নিয়মিত বিতর্ক ও আলোচনা চলতে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য ধর্মের সঙ্গেও ইসলামের তুলনা চলতো। সেই তর্ক-বিতর্ক কিংবা আলোচনার মাধ্যমে তাদের জোর প্রচেষ্টা ছিল, আমাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করা। কিন্তু মহান আল্লাহ যেভাবে আমাকে ইসলামের দিশা দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন, সেভাবে এই বিপদসংকুল ঝড়ের সামনেও ইসলামের ওপর অটল থাকার শক্তি দিয়েছেন। সেই পণ্ডিতদের বিতর্ক ও সমালোচনা আমার ঈমান ও আকিদাকেই শুধু বৃদ্ধি করেছে। ইসলামের মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার জন্য মুষ্টিকে শানিত করেছে। আমার জীবনে প্রশান্তির ছায়া দান করেছে। সর্বোপরি আমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বাড়িয়েছে।

তখন থেকেই আমি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—আমি এসব অসার ধর্ম ও বিশ্বাসের বিভ্রান্তি সম্বন্ধে এমন একটি সন্তোষজনক গ্রন্থ প্রণয়ন করবো, যা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে, যদিও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এত কাঁচখড় পোড়াতে হয় না।

সেই থেকেই আমার মনে বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তা অপরকে জানানোর আগ্রহ গাঁথে যায়। এগুলোর সঙ্গে ইসলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা ঝোঁকও পেয়ে বসে। এই চিন্তা আমার মন-মগজ থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বরং এমনটা বললেও অত্যাুক্তি হবে না যে, এই চিন্তা থেকে আমার জীবনের একটি মুহূর্তও মুক্ত ছিল না। সুতরাং আমি আহলে কিতাব ও অগ্নি উপাসকদের বিভিন্ন বইপুস্তক থেকে তথ্য ও উপাত্ত আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সেসবে নিজের উদ্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ি। আমি

আশা করি, এই ময়দানে অবদান রাখা মানুষগুলোর কাতারে আমিও অংশীদার হবো। সেই সঙ্গে আমি এ-ও কামনা করি যে, সম্পূর্ণ কাজটি সাধারণ মুসলিমদের জন্য উপকারী হবে, বিশেষ করে ওইসব নও মুসলিমের জন্য সহায়িকা হবে, যারা আমার মতো পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন অহরহ।

আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমার হৃদয়কে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় রেখেছেন। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পার হওয়ার পর এ বিষয়ে আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের তাওফিক দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে একটাই চাওয়া যে, তিনি যেন এই কাজটি কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই কবুল করেন। তিনি উত্তম অভিভাবক, উত্তম সহযোগী।

সালাত ও সালাম আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল নবি-রাসুলগণের ওপর।

—গ্রন্থকার

মদিনা মুনাওয়ারায় লিখিত

১০ রমজান, ১৪০৪ হিজরি

(আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।)



লেখকের ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد:

হিন্দুস্তান তথা ভারতবর্ষের ধর্মগুলো অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্মের ওপর রচিত এটি একটি ছোট পুস্তিকা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় বিশ বছরের। মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত ইসলামি ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় আমি হিন্দুধর্ম নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এরপর অন্যান্য গবেষণা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমার সেই কাজের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। কিন্তু তখন থেকে আমি সুযোগ পেলেই এই জাতি সম্পর্কে লিখিত বইপুস্তকে গভীরভাবে নজর বুলাতে থাকি।

১৪০৯ হিজরিতে আমার রচিত গ্রন্থ *আল-ইহুদিয়াহ ওয়া ল মসিহিয়াহ* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, হিন্দুস্থানের ধর্মগুলো নিয়েও আমি কলম ধরবো। সেই প্রতিশ্রুতি-পূরণে এই গ্রন্থটি রচনা করা আমার ওপর আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

আলহামদুলিল্লাহ, আজ সে দিনটি আমার সামনে সমুপস্থিত। এই গ্রন্থটির রচনা আমরা শেষ করতে পেরেছি। যখন একজন মুসলিমকে আমি তার দীন ও আকিদাকে আঁকড়ে ধরে জীবনযাপন করতে দেখি, তখন আমি মনস্তাত্ত্বিক সৌভাগ্যে সিক্ত হই। সেই মুসলিম তার চারপাশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে দেখে। অতঃপর সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত হয়, যে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন—

৫. অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি হিন্দুদের নিজেদের লেখা গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছি। তাই পাঠক গবেষণাটির মাঝে তাদের অতীত ও বর্তমানের বহু পণ্ডিতবর্গের আলোচনা দেখতে পাবেন। বিশেষভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের সমুন্নত ভাবমূর্তি রয়েছে। অনেক সময় আমি ব্যাপক প্রচলিত বিষয়ে আমার জানাশোনার ওপর নির্ভর করে রেফারেন্স উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি।

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আমি ১৪০০ ও ১৪০১ হিজরিতে মদিনায় অবস্থিত ইসলামি ইউনিভার্সিটিতে হাদিস বিভাগে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পাঠদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। ফলে, সে-সময়ে আমার কাছে ধর্মগুলো সম্পর্কে বিশাল এক তথ্যভাণ্ডার জমা হয়। সেই তথ্যভাণ্ডারের একটি অংশ *আল-ইহুদিয়াহ ওয়াল মসিহিয়াহ*^১ নামে ১৪০৯ হিজরিতে প্রকাশিত হয়।

আমার সঞ্চিত সেই তথ্যভাণ্ডারের দ্বিতীয় অংশ প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, বিন্যাস ও সংযোজনপূর্বক *ফুসুলুন ফি আদইয়ানিল হিন্দ* (হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মের ইতিহাস) নামে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি। আশা করছি, গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে জ্ঞানান্বেষীদের উপকারে আসবে। আর বিশেষভাবে যারা পৌত্তলিক সমাজে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন, তাদের উপকারে আসবে। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যাতে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দান করেন। এবং আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করেন।

আল্লাহুন্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন।

—লেখক

(আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)

মদিনা মুনাওয়ারা

১৫/০৬/১৪১২ হিজরি

পুননিরীক্ষণ : ২৫/১২/১৪১৬ হিজরি

[^১] বইটি বাংলায় *ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস* নামে মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়।-অনুবাদক



লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ্ অবিভক্ত ভারতের আজমগড়ের একটি সাধারণ হিন্দু পরিবারে ১৩৬২ হিজরি মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত তিনি সেখানেই লেখাপড়া করেন। এ সময় তিনি ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। প্রচুর গবেষণা ও অধ্যয়নের পর তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশেষ করে তিনি *দ্বীনে হক* পুস্তিকাটি পড়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আজমগড় শিবলি কলেজে পড়ার সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল বঙ্কেরাম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের নাম পালটে রাখেন ইমামুদ্দিন। পরবর্তী সময়ে হিন্দুদের নির্যাতনের ভয়ে তিনি পুনরায় নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাখেন। প্রথম দিকে গোপনে সালাত ও সাধ্যমতো ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করলেও একসময় তা পরিবারে জানাজানি হয়ে যায়। তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তার পিতা ও আত্মীয়স্বজনরা মেনে নিতে পারেননি। তাকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা পুরোদমে চেষ্টা করতে থাকেন। তারা তার হাতখরচ ও লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যার হুমকি দেন। প্রাণনাশের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে তিনি পাকিস্তান হিজরত করেন।

পাকিস্তানে তিনি একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। উপমহাদেশের অধিকাংশ মাদরাসার মতো উক্ত মাদরাসাতেও ফিকহে হানাফি অনুযায়ী পাঠদান করা হতো। কিন্তু তিনি ফিকহি ও ফিকরি দিক থেকে এই মাদরাসার পাঠ্যসূচির সঙ্গে একমত হতে পারেননি। এ সম্পর্কিত আলোচনা তিনি তার *আবু হুরায়রা রা. ফি দওই মরবিয়্যাতিহি* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এরপর তিনি সৌদি আরবে হিজরত করেন। সেখানে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে হাদিস নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। এরপর তিনি মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি হাদিস, তাফসির, ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রতি তার ঝোঁক ছিল প্রবল।

কর্মজীবনে ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. প্রথমে মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত রাবেতাতুল আলামিল ইসলামির জেনারেল সেক্রেটারির অফিসের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি সেখানকার হাইআতুত তাদরিসের (শিক্ষক পরিষদ) সদস্য মনোনীত হন। ধীরে ধীরে তিনি প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি সেখানকার কুল্লিয়াতুল হাদিসের (হাদিস ফ্যাকাল্টি) প্রধান মনোনীত হন। এ সময় তিনি ছাত্রদের গবেষণাপত্রের সুপারভিশনের পাশাপাশি *সহিহুল বুখারি*, *সহিহ মুসলিম* সহ বিভিন্ন বিষয়ে দরস দিতেন।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমিকে সৌদি সরকার অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেন। তৎকালীন রাবেতাতুল আলামিল ইসলামির সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ বিন আলি আল-হরাকানের সুপারিশে তিনি সৌদি আরবের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ জীবনের অধিকাংশ সময় ইলমে নববির খেদমতে ব্যয় করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন। সৌদি আরবের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। আরবি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পাশাপাশি অনেকগুলো গ্রন্থের তাহকিকও (সম্পাদনা) তার কলমে সম্পন্ন হয়।

হিজরত করে সৌদি আরবে থিতু হলেও ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি ভারতে নিজ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পিতামাতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাদির জোগান দিতেন। তিনি সর্বদা পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন।

সূচিপত্র

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ২৯

ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা	৩০
আর্যদের ভারতবর্ষে আগমন	৩৩
ভারতীয়দের হিন্দু সমাজে একীভূত হওয়া	৩৭
নতুন চিন্তাধারার আধ্রাসন	৩৭
হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা	৩৮
হিন্দুধর্মে বিশ্বাসের জটিলতা	৩৮
হিন্দুধর্মের নাম	৩৯
হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের সংকলনের পর্যায়সমূহ	৪০
প্রথম পর্যায়	৪০
দ্বিতীয় পর্যায়	৪০
তৃতীয় পর্যায়	৪১
চতুর্থ পর্যায়	৪১
পঞ্চম পর্যায়	৪২
হিন্দুধর্মের মৌলিক ধর্মীয় উৎস সম্পর্কে পর্যালোচনা	৪২
এক. বেদ (VEDA)	৪২
ক. ঋগবেদ (RIG VEDA)।	৪৪
খ. যজুর্বেদ (YAJUR VEDA)।	৪৫
গ. সামবেদ (SAM VEDA)।	৪৫
ঘ. অথর্ববেদ (ATHER VEDA)।	৪৬
বেদের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি	৪৬
প্রথম	৪৬
দ্বিতীয়	৪৬
তৃতীয়	৪৬

স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী	৪৭
দুই. উপনিষদ (UPNISHAD)	৪৯
উপনিষদের সংখ্যা	৪৯
তিন. পুরাণ (PURAN)	৫২
পাঁচ. মহাভারত (MAHA BHARAT)	৫৩
গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপট	৫৪
ছয়. গীতা (GEETA)	৫৫
সাত. রামায়ণ (RAMAYAN)	৫৭
আট. বেদান্ত (VEDANT)	৬১
বেদান্ত ব্যাখ্যাকারগণের দৃষ্টিভঙ্গি	৬২
উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য	৬২
নয়. যোগবশিষ্ঠ (YOGAVASISHTA)	৬৩
দশ. ধর্মশাস্ত্র (DHARMA SHASTRA)	৬৫
ধর্মশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়	৬৫

হিন্দু সমাজের শ্রেণিবৈষম্য ৬৮

প্রথম শ্রেণি : ব্রাহ্মণ	৭০
দ্বিতীয় শ্রেণি : ক্ষত্রিয়	৭১
তৃতীয় শ্রেণি : বৈশ্য	৭২
চতুর্থ শ্রেণি : শূদ্র	৭৩
দলিত শ্রেণির ইসলামে প্রবেশ	৭৬
তামিলনাড়ুর ভৌগোলিক অবস্থান	৭৬
জনসংখ্যা	৭৬
মুসলিম জনসংখ্যা	৭৬
খ্রিষ্টান জনসংখ্যা	৭৬
এক. তামিল পত্রপত্রিকা	৭৭
দুই. উর্দু পত্রপত্রিকা	৭৮
তিন. ইংরেজি পত্রপত্রিকা	৭৯

হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় বিধিবিধান ৮৩

প্রথম স্তর : ব্রহ্মাচার্য আশ্রম বা জ্ঞান অর্জনের স্তর	৮৩
দ্বিতীয় স্তর : গার্হস্থ আশ্রম তথা পারিবারিক জীবন	৮৬
তৃতীয় স্তর : বাণ আশ্রম তথা দৈহিক ও আত্মিক দীক্ষার যুগ	৮৬
চতুর্থ স্তর : সন্ন্যাস আশ্রম তথা পুরোহিত জীবন	৮৭

পারিবারিক আইন ৮৯

বিবাহ	৮৯
একাধিক স্ত্রী	৮৯
বিধবা বিবাহ	৯০
বৈবাহিক সূত্রে নিষিদ্ধতা	৯১
কম বয়সে বিবাহ তথা বাল্যবিবাহ	৯১
বিবাহবহির্ভূত ভোগ	৯২
পর্দা	৯২
ঋতুস্রাবের সময় আলাদা থাকা	৯২

হিন্দুদের বিভিন্ন উপদল ৯৩

বিষ্ণু সম্প্রদায়	৯৩
বিষ্ণুর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা	৯৩
শিব সম্প্রদায়	৯৪

মূর্তিপূজা ৯৫

গো-উপাসনা	৯৭
-----------	----

হিন্দুধর্মে উপাসনা ৯৮

প্রার্থনা	৯৮
উপবাস	৯৯
তীর্থযাত্রা	১০০
তীর্থযাত্রার শিষ্টাচার	১০১

হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা-বিশ্বাস ১০২

এক. হিন্দু চিন্তাধারায় জগতের সৃষ্টি	১০২
বৈদিক চিন্তাধারায় জগতের সৃষ্টি	১০৫
বৈদান্তিক চিন্তাধারা	১০৬
পৌরাণিক চিন্তাধারা	১০৬
দুই. অবতারবাদ	১০৭
অবতারের প্রকারভেদ	১০৮
ক. পূর্ণাবতার	১০৮
খ. অংশাবতার	১০৯
গ. কালী অবতার	১১০

ঘ. অধিকারী অবতার	১১০
তিন. পুনর্জন্মবাদ	১১১
হিন্দুধর্মে প্রলয়	১১২
ক. সত্যগুণ	১১৩
খ. তাম্যগুণ	১১৩
গ. রজুগুণ	১১৩
প্রথম দলিল	১১৪
দলিল খণ্ডন	১১৪
দ্বিতীয় দলিল	১১৪
দলিল খণ্ডন	১১৪
তৃতীয় দলিল	১১৫
দলিল খণ্ডন	১১৫
চতুর্থ দলিল	১১৫
দলিল খণ্ডন	১১৫
চার. কর্মবাদ	১১৯
পাঁচ. নির্বাণ	১২০

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৩

বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ	১২৭
প্রথম আর্যসত্য : দুঃখের অস্তিত্ব	১২৮
দ্বিতীয় আর্যসত্য : দুঃখের কারণ	১২৮
তৃতীয় আর্যসত্য : দুঃখ ও কষ্টের অবসান	১২৯
চতুর্থ আর্যসত্য : দুঃখ-কষ্ট অবসানের সহায়ক কর্মকাণ্ড	১২৯
কষ্ট ও বিপদের কারণ	১৩১

বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের ধারণা ১৩৩

প্রথম দলের প্রমাণাদি	১৩৪
দ্বিতীয় দল তথা স্বপক্ষবাদীদের প্রমাণাদি	১৩৫
বৌদ্ধদের চার সঙ্গীতি (সম্মেলন)	১৩৮
প্রথম সঙ্গীতি	১৩৮
দ্বিতীয় সঙ্গীতি	১৩৮
তৃতীয় সঙ্গীতি	১৩৮
চতুর্থ সঙ্গীতি	১৩৮
বৌদ্ধ দল-উপদল	১৩৮

প্রথম দল : হীনযান	১৩৮
দ্বিতীয় দল : মহাযান	১৩৯
বৌদ্ধধর্মে উপাসনা	১৩৯
উপাসনাকালীন বৌদ্ধদের গীত	১৪০
বৌদ্ধধর্মের প্রসার	১৪১

জৈনধর্ম ১৪৩

জৈনধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৪৩
মন্তব্য	১৪৪
মহাবীর স্বামীর জ্ঞান-বিজ্ঞান সংকলন	১৪৪
ঐতিহাসিক সমালোচনা	১৪৫
বড় দল দুটিতে মৌলিক বিরোধ	১৪৫
প্রথমত : পার্থিব সম্পর্ক	১৪৫
দ্বিতীয়ত : মহিলাদের মোক্ষ লাভ বিষয়ে বিরোধ	১৪৬
তৃতীয়ত : পূর্ণ তাপস	১৪৬
জৈনদের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস	১৪৮
জৈনদের কাছে ঈশ্বরবাদ	১৪৮
জৈনদের কাছে পুরুষদের প্রকারভেদ	১৪৯
জৈনদের কাছে মূর্তিপূজার দর্শন	১৫০
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে জৈনধর্মের প্রভাব	১৫১
১. মূর্তিপূজা ও উপাসনালয় বিনির্মাণ	১৫১
২. অহিংসা	১৫১
৩. পুনর্জন্মবাদ	১৫১
৪. সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য	১৫২
৫. নগ্নতা	১৫২

শিখধর্ম ১৫৩

ক. জ্ঞানার্জনের পথ	১৫৩
খ. গুরুভক্তি ও ভালোবাসার মতাদর্শ	১৫৪
গ. রামের প্রতিমায়ন	১৫৫
ঘ. কৃষ্ণের প্রতিমায়ন	১৫৫
১. সকল ধর্মের ঐক্য বা একতা	১৫৬
হিন্দুধর্ম থেকে শিখদের সংগৃহীত বিষয়াদি	১৫৯
ক. জীবনের লক্ষ্য	১৫৯

খ. সর্বেশ্বরবাদ	১৬০
গ. হিন্দুদের কল্পকাহিনি	১৬১
ঘ. গান-বাজনা	১৬২
শিখ ও হিন্দুধর্মের বৈপরীত্য	১৬৩
ইসলামের আলো থেকে শিখধর্মের সংগৃহীত বিষয়াদি	১৬৯
মহান আল্লাহর কতিপয় গুণাবলি	১৬৯
শিখদের পঞ্চভিত্তি	১৭৬
হিন্দুশাস্ত্রে সুসংবাদবাণী	১৭৯
আদম ও হাওয়ার উপস্থিতির কাহিনি	১৮৪
আদমের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন	১৮৫
নবি ও রাসুলদের প্রেরণ	১৮৬
৪. মহাঋষি কালকি আট গুণে গুণায়িত হবেন।	১৯০
প্রথম : প্রজ্ঞা (Pragya)	১৯১
দ্বিতীয় : কুলীনতা (Culinata)	১৯১
তৃতীয় : ইন্দ্রিয়দমন (Indridaman)	১৯২
চতুর্থ : শ্রুত (Shrut)	১৯৩
পঞ্চম : পরাক্রম (Prakram)	১৯৪
ষষ্ঠ : অল্পভাষী	১৯৫
সপ্তম : দান (Dan)	১৯৬
অষ্টম : কৃতজ্ঞতা (Kritagyata)	১৯৭
নরাশংসর সুসংবাদ দান	২০৬
শেষ কথা	২১৯

ਟਿਕੁ ਆਰਿਓ
ਟੇਰਿਟਾਸ



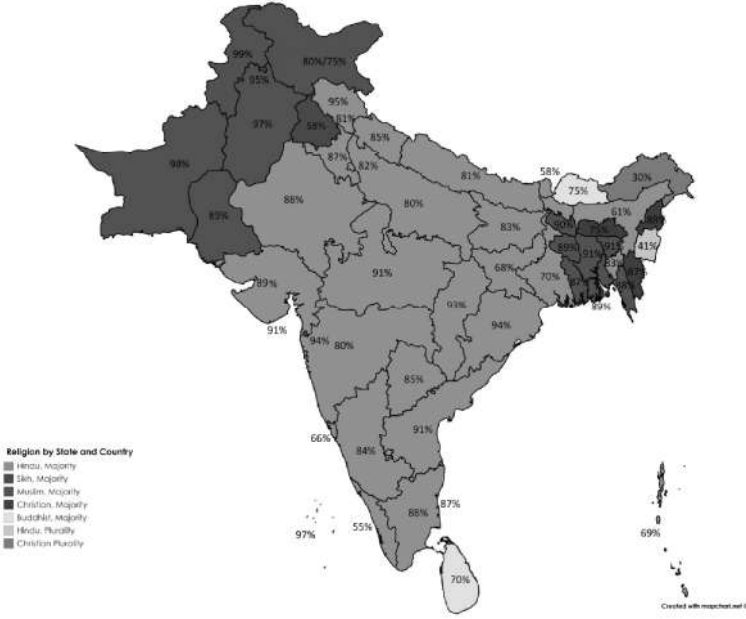
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

দৈর্ঘ্যের বিশালত্ব, জনসংখ্যার আধিক্য ও প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই ভারতবর্ষ বলতে বোঝায় উত্তরের হিমালয় পর্বত থেকে নিয়ে কাশ্মীর ও ভূটান পর্যন্ত, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে সিন্ধু অঞ্চল ও পূর্বে বামা^[১] পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল অঞ্চল। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থসমূহের ধারাভাষ্য অনুযায়ী, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ (হিন্দুস্তান) বলতে এই বিশাল ভূখণ্ডকে বোঝাত না। বৈদিক ভারত (VEDIC INDIA) বলতে বোঝানো হতো, কাশ্মীর থেকে নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ এবং সিন্ধু অঞ্চল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের বিশাল অংশকে বৈদিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হতো না।



বৈদিক ভারতের (VEDIC INDIA) মানচিত্র

[১] বর্তমান মিয়ানমার।-অনুবাদক



ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার চিত্র

ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা

খ্রিষ্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দ পূর্ব থেকে বসবাসরত ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী সম্পর্কে পৃথিবীর জাতিসত্তার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই লেখা হয়নি। তবে এ অঞ্চলে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদারো (MOHANJODAR) সভ্যতার আবিষ্কার এটাই প্রমাণ করে। কোনো কোনো গবেষকের মতে, এই আবিষ্কারের ফলে বোঝা যায় যে, এ অঞ্চলে মানুষের শারীরিক গঠন, বর্ণ ও জাতিগতভাবে একটি মিশ্র প্রজন্মের অস্তিত্ব ছিল। তারা বলেন, ইতিহাসে এরা ‘দ্রাবিড়’ নামে পরিচিত। কোল ও তুরানি জাতির সংমিশ্রণে দ্রাবিড়দের উৎপত্তি। কোল হলো পাহাড়, বন ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবর জাতি। ইতিহাস এদেরকে জংলি বা বন্যমানব হিসেবে অভিহিত করেছে। অপরদিকে তুরানিরা তুর্কিস্তানের অধিবাসী। এরা খ্রিষ্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর পূর্বে হিন্দুস্তানে আগমন করে। এখানে এসে তারা কোল সম্প্রদায়কে পরাভূত করে নিজেদের অধীন করে নেয়। কালপরিক্রমায় তুরানি সম্প্রদায় কোল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়। এই সংমিশ্রণ থেকে নতুন একটি জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটে। এই নতুন জাতিসত্তাই পরে দ্রাবিড় নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই দ্রাবিড়রা সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরই তাদের প্রকৃত নিবাস। এইসব অঞ্চলে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সে-সব নিদর্শন নিয়ে এখনও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

দ্রাবিড়রা সিন্ধু উপত্যকা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করে। সেখানে তারা ভাষাগত দিক থেকে চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভাষাগুলো হলো— কন্নড়, মালয়ালম, তেলেগু ও তামিল। এরাই আর্যদের সঙ্গে শত শত বছর পর্যন্ত সংগ্রাম করে অবশেষে পরাভূত হয়েছে। কেননা, আর্যরা শক্তিমত্তা, উন্নত সভ্যতা ও যুদ্ধবিদ্যায় দ্রাবিড়দের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। দুই জাতির মাঝে সংঘটিত এসব যুদ্ধে আর্যরা নানা প্রকার লৌহজাত অস্ত্র ব্যবহার করে। অপরদিকে দ্রাবিড়দের হাতিয়ার ছিল স্ফেদ্র অস্ত্র, কাঠ ও পাথর নির্মিত।

এই যুগে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে নিয়ে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর আবির্ভাবের আগপর্যন্ত সময়ে আমরা এ অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ দেখতে পাই। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল প্রথমত হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে। অতঃপর আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে।

এই যুদ্ধগুলো শুধু রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এগুলো বিরাজমান ছিল সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ময়দানেও। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এই যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল। শেষাবধি আর্যদের বিজয়ের মাধ্যমে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখানকার মূল অধিবাসীরা তাদের অধীন হয়ে পড়ে। অতঃপর আর্যরা তাদের জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করতে শুরু করে। তারা মূল অধিবাসীদেরকে বৈদিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তারা ভারতবর্ষের অধিবাসীদেরকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে।

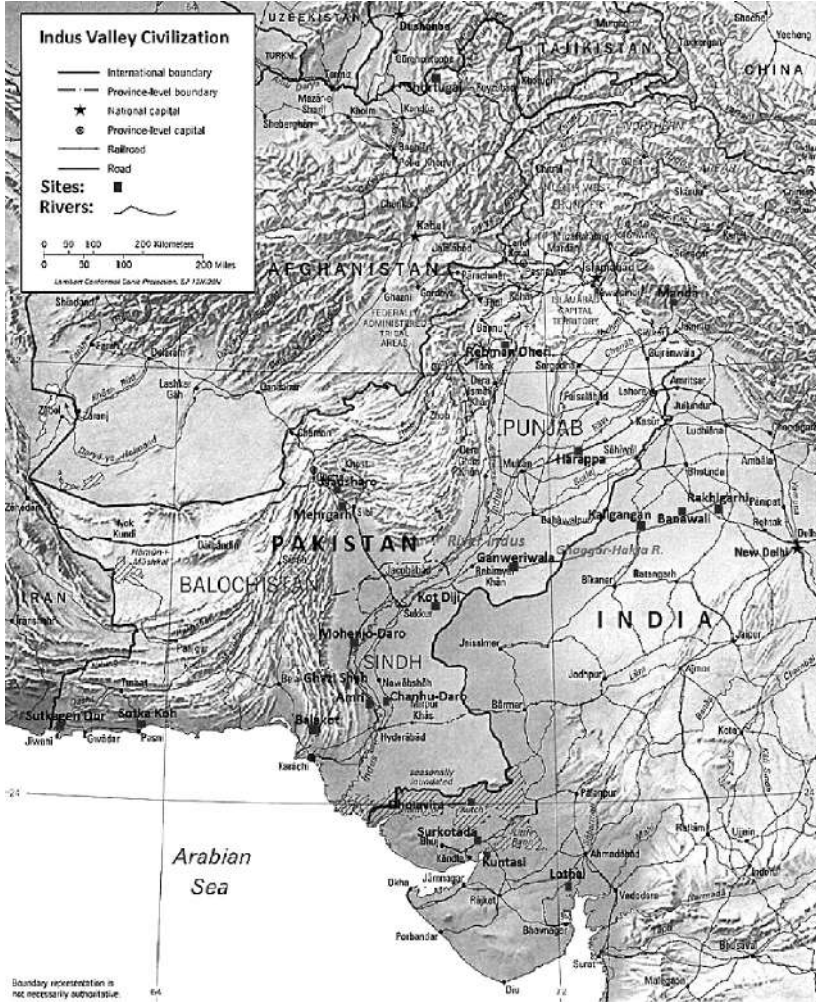
প্রথম শ্রেণি : ব্রাহ্মণ। এরাই মূল আর্য সম্প্রদায়।

দ্বিতীয় শ্রেণি : ক্ষত্রিয়। এরা যোদ্ধা শ্রেণি। এরা মূলত রাজপুত্র ঘরানার। তবে তুলনামূলক বিশুদ্ধ মতটি হলো—এরাও আর্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসের সূচনালগ্নে যেসব রাজা ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন, এরা তাদের বংশধর।

তৃতীয় শ্রেণি : বৈশ্য। এরা তুরানি ও কোল সম্প্রদায়ের লোকজন। যারা পরবর্তী সময়ে দ্রাবিড় নামে পরিচিতি লাভ করে।

চতুর্থ শ্রেণি : শূদ্র। এরা দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের ওইসব লোক, যারা আর্যদের বশ্যতা মেনে নেয়নি এবং তাদের সঙ্গে বৈদিক সমাজে একীভূত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে তারা আর্যদের দাসশ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। আমরা পরে এ শ্রেণিগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

আর্যরা এই শ্রেণি-বিভাজন, প্রাকৃতিক শক্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ, উপাসনার নানান পদ্ধতি ও ধর্মগীতি উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে গৌতম বুদ্ধের আগমন। তিনি এসে আর্যদের মতবিশ্বাস, আচার-প্রথা এবং মানবজাতিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।



ইন্দুস ভ্যালি সভ্যতার মানচিত্র। মহেঞ্জোদারো ছিল এই সভ্যতারই একটি সমৃদ্ধ শহর

আর্যদের ভারতবর্ষে আগমন

সংস্কৃত ভাষায় আর্য শব্দটির অর্থ হলো অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত। এরা সাদা চামড়া ও কালো চুলের অধিকারী জাতি। তাদের ভাষা সংস্কৃত। পরবর্তীকালে আর্য শব্দটি এমন একটি জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়, যাদের আদি উৎস সঠিকভাবে জানা যায় না। কোনো কোনো গবেষকের ভাষ্য হলো, তারা ইউরোপের দানিযুব অঞ্চলে বেড়ে ওঠা জনগোষ্ঠী। পরবর্তীকালে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তারা এশিয়ায় আবাস পরিবর্তন করে। আধুনিক গবেষণা বলছে, তাদের রং অনেকটা সোনালি রঙের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি তাদের দেবতা ইন্দ্রের কঙ্কিত বর্ণ। যেমন ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয় তাদের দেবতা ঋগ্বেদের বর্ণ হলো সোনালি।’

ঋগ্বেদের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ‘একজন পূজারি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো, যাতে ঈশ্বর তাকে সোনালি বর্ণের সম্ভ্রান্ত দান করেন।’ এই সাদৃশ্যের কারণে গবেষকগণ দাবি করেছেন যে, আর্যরা মূলত ইউরোপিয়ান জাতি। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে বেশ কিছু মাথার খুলি পাওয়া গেছে, যেগুলো অনেকাংশে আর্যদের খুলির সঙ্গে মিলে যায়। তাই তারা বলেন, আর্যরা জীবিকা অন্বেষণের নিমিত্তে দানিযুব নদী পাড়ি দেয়। অতঃপর বসফরাস, ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে সিন্ধুতে এসে পৌঁছায়। এই দীর্ঘ সফরে পাড়ি দেওয়া অঞ্চলগুলোতে তারা তাদের একটি দলকে রেখে আসে। এসব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের কোনো সংঘর্ষ না হলেও সিন্ধুর অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের দীর্ঘ সময়ব্যাপী যুদ্ধ হয়। প্রায় এক হাজার বছর ধরে এসব যুদ্ধ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সিন্ধুর অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করে। আবার অনেকে বনজঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়। আবার তাদের আরেকটি দল দেশত্যাগ করে উত্তর ভারতে দিকে চলে যায়। সেখানে তারা বৈদিক সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়। অবশিষ্টরা আর্যদের দাসে পরিণত হয়। এদেরকেই তারা দ্রাবিড় নামে নামকরণ করে।

গোস্তাভ লি বোন মনে করেন, তাদের দেশত্যাগের দুটি পথ খোলা ছিল।

এক : ইউরোপ অভিমুখী পথ।

দুই : ইরান অভিমুখী পথ।

আবার আরেক দল গবেষক মনে করেন, আর্যরা জাতিগতভাবে এশিয়ান। তারা মধ্য-এশিয়ায় তুর্কিস্তানের জিহুন নদীর কাছে বসবাস করতো। অতঃপর কোনো এক অজানা সময় এদের বিশাল বিশাল শ্রেণিগোত্র বসবাসের স্থান ত্যাগ করে। তাদের একদল ইউরোপ অভিমুখে পাড়ি জমায়। আরেক দল ইরান হয়ে ভারতবর্ষে আগমন করে। তবে গোস্তাভ লি বোন মনে করেন, আর্যরা মূলত ইরানেরই অধিবাসী। তিনি তার ‘হাদারাতুল

হিন্দু^[২] গ্রন্থে বলেন, ‘আমি এখানে আর্যদের আদি উৎস বিষয়ে নতুন কোনো ধারণার প্রস্তাব করছি না। বরং আমি উল্লেখ করছি সম্ভাব্য তুলনামূলক সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয়টি। আর তা হলো, আর্যরা মূলত ইরানের অধিবাসী আর ভারতবর্ষে তাদের প্রতিবেশীরা সেখানে সন্দেহাতীতভাবে দফায় দফায় অনুপ্রবেশ করেছে। একইভাবে তাদের পূর্বপুরুষরা ইতিপূর্বে ইউরোপে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। প্রচলিত মতের বিপরীতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, বিজিত জাতিগুলোতে তাদের রক্তের প্রভাব ছিল খুবই দুর্বল।’

আর্যদের পারসিক হওয়ার সপক্ষে আমি একটি ভাষাগত প্রমাণও উপস্থাপন করছি। আর তা হলো—সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শব্দ ও অর্থগত দিক থেকে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইতিহাসে এ কথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ভারতীয়রা পারস্য গিয়ে তাদের বিভিন্ন শব্দ ধারণ করেছে। তাই ভাষাবিদগণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, সংস্কৃত ভাষাভাষী তথা আর্য ও পারসিকগণ একই অঞ্চলের অধিবাসী।

পাঠক সন্নিপে এ পর্যায়ে আমরা এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু শব্দ ও তার অর্থ তুলে ধরছি।^[৩]

ফারসি	সংস্কৃত	বাংলা
আকুশত	আকুশত	আঙুল
বাজু	বাহু	বাহু
দন্ত	হস্ত	হাত
জিরম	জিরম	চামড়া
যানু	জানু	উরু
নর	নর	পুং
পায়	পাও	পা
খুন	শোণ	রক্ত
সের	সের	মাথা

[২] হাদারাতুল হিন্দ, পৃষ্ঠা : ২৬০

[৩] লেখক মূল গ্রন্থে শব্দগুলোর আরবি অর্থ তুলে ধরেছেন। আমরা পাঠকের সুবিধার্থে শুধু বাংলা অর্থ তুলে ধরলাম।-অনুবাদক

আব্র	আব্র	ব্র
কাদ্দু (গুল)	গুল কাদ্দু	ফুল
খোয়াব	শোয়াব	ঘুম
শব	শবা	রাত
পেদর	পেতর	পিতা
মাদর	মাতর	মাতা
বেরাদর	ভাদর	ভ্রাতা
দুখতর	দুহতর	কন্যা
খেসর	শ্বশুর	শ্বশুর
রোম	রোম	লোম
পঞ্জ	পঞ্জ	পাঁচ
পঞ্জুম	পঞ্জুম	পঞ্চম
হাফত	সপ্তম	সপ্তম
শশুম	ষষ্ঠম	ষষ্ঠ
নভুম	নবম	নবম
দাহুম	দশম	দশম
এক	এক	এক
তারা	তারা	তারা
হুর	সূর্য	সূর্য
মাহ	মাস	মাস
রোজ	রোজ	দিন
শাম	শাম	সন্ধ্যা
মাহর	মাহর	সূর্য